‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’ ঃ নাস্তিক ভূতের উপাখ্যান

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’ গল্পটি প্রথম বেরয় ‘প্রবাসী’ -তে আষাঢ় ১৩৩৮ (১৯৩১ খ্রি.)-এ। এটিই অবশ্য ‘প্রবাসী’ -তে পরশুরামের প্রথম গল্প নয়। তার আগে আশ্বিন ১৩৩৬-এ ‘গল্পিকা’’ নামে তাঁর চারটি ছোটো ছোটো গল্প ঐ পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল (‘‘পুনর্ম্মিলন’’, ‘‘উপেক্ষিতা’’, ‘‘উপেক্ষিত’’ ও ‘‘রাতারাতি’’), আর আশ্বিন ১৩৩৭-এ। ‘‘ছেলেধরা’’। ‘গল্পিকা’র সঙ্গে যতীন্দ্রকুমার সেনের ছবি ছিল, কিন্তু ‘‘ছেলেধরা’’ আর ‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’ একেবারেই নিশ্চিত্র।

এই সবকটি গল্পই পুরনো ও নতুন ছবি সমেত ‘হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প’ (১৩৪৪)-য় ঠাঁই পেয়েছে, কিন্তু ঠিক এক চেহারায় নয়। এ বই-এর ‘‘রাতারাতি’’ পুরোপুরি নতুন করে লেখা : ‘‘ছেলেধরা’’ আর গল্পিকা’রাতারাতি’’ মিশে একটি আলাদা গল্প তৈরি হয়েছে। ‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’ ওরকম আগাপাশতলা পাল্টায় নি, তবে ‘প্রবাসী’-র পাঠে বেশ কিছু অদলবদল করা হয়। তার কয়েকটি লক্ষ্য করার মতো।

‘প্রবাসী’-তে যিনি ছিলেন সাতকড়ি কুণ্ডু, নতুন পাঠে তিনি হয়েছেন হরিনাথ কুণ্ডু। শিবচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল -এর নাম প্রথম পাঠে বলা হয়নি, বই-এর গল্পে তিনি যদু সাণ্ডেল (অর্থাৎ সান্যাল) নামে হাজির। ‘প্রবাসী’ - তে সাতকড়ি, মহেশ ও ত্রিলোচন পাকড়াশীর সংলাপে ক্রিয়াপদে মাঝেমাঝে (সর্বদা নয়) খাঁটি কলকাত্তাই ‘চ’ ছিল: পড়চে, দেখচ, রাখচি, বদলেচে, করেচি; চাটুজ্যে মশায়ও গল্পটা বলার সময়ে কখনও কখনও এমন কলকাত্তাই ‘চ’ উচ্চারণ করেন : বলেচেন, দেখেচেন, পাঠিয়েচেন, ভেংচাচ্চে। বই-এ অবশ্য এই সব ‘চ’-ই ‘ছ’ আর ‘চ্চ’গুলো ‘চ্ছ’ হয়েছে। (প্রিন্সিপাল-এর কথায় কলকাত্তাই ‘করলুম’ অবশ্য দুটি পাঠেই বহাল আছে)।

সবচেয়ে বড় তফাত হয়েছে মহেশের কবিতায়। প্রথম পাঠে ছিল : ‘‘কুণ্ডু সাতকড়ি/ মুণ্ডু পাত করি।’’ সেটি হয়ে গেছে : ‘‘কুণ্ডু হরিনাথ,/ মুন্ডু করি পাত।’’ পরের চরণ দুটিতেও অনিবার্যভাবে কিছু রদবদল ঘটে। যেমন, ‘‘ওরে সাতকড়ে,/ হবি তুই ম’রে/ নরকের পোকা/ অতিশয় বোকা’’ -এই চরণগুলির বদলে মহেশ লেখেন : ‘‘সাতকড়ি ওরে, / কাত করি’ তোরে/ পিঠে মারি চড়/ মুখে গুঁজি খড়/ জ্বেলে দেশলাই/ আগুন লাগাই।’’ এই কবিতায় বই-এর পাঠের সঙ্গে সাতকড়ি-র নাম ছাড়া, আর কোনো মৌলিক তফাত নেই।

সাতকড়ি-র নাম পাল্টে হরিনাথ করে কী লাভ হলো? পরশুরাম বেঁচে থাকতে কেউ সেটি জিগেস করেন নি - অন্তত তাঁর উত্তরটা ছাপিয়ে রেখে যান নি। তাই অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার অনুমান : ‘কড়ি’ আর ‘করি’, ‘কড়ে’ আর ‘ম’রে’ - এই মিলগুলো পরশুরামের মনে ধরে নি। তার জন্যেই ড়-বর্জিত নাম।

প্রথম পাঠের সঙ্গে বানানেও কিছু গৌণ তফাত আছে : কয়েকটি হসন্ত ও ইলেক বাদ পড়েছে। চোখে পড়ার মতো আর একটি তফাতই বলত্রা যায় : প্রথম পাঠে মহেশ মিত্তির ছিলেন চরণ ঘোষের পিসে; দ্বিতীয় পাঠে তিনি হয়ে গেছেন চরণ ঘোষের মামার শালা।

ওপরে যেসব কথা লেখা হলো তাতে নিশ্চয়ই সকলের আগ্রহ থাকবে না। আসলে তো একই মজার গল্পর দুটো পাঠ : দু-এর মধ্যে তো আকাশপাতাল ফারাক নেই। তবে এমন খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়া কেন?

খুব কি ভুল হবে যদি বলি : ‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’ পরশুরামের সেরা দশটি গল্পর একটি? সারা গল্পে একটিও অবান্তর কথা নেই। প্রথমে আসে বংশলোচনবাবুর চেনা আড্ডার ‘সেটিং। বাঘের গল্পর পালা চুকেছে, লম্বকর্ণ নিয়ে জোড়া গল্প (‘‘লম্বকর্ণ’’ ও ‘‘গুরুবিদায়’’) শেষ হয়েছে, কার্তিক - বাঁটলো - জিগীষাদেবনী ও সুষেণবাবুও বিদায় নিয়েছেন। বংশলোচন গল্পমালার শেষ গল্প হয়ে দেখা দেয় ‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’। ব্যস, ঐ আড্ডা ও তার আড্ডাধারীরা পরশুরামের গল্পজগৎ থেকে চিরতরে বিদায় নেন। তারপর আসে অন্য আড্ডা ও অন্য আড্ডাধারী; বেলেঘাটার আড্ডা উধাও হয়ে যায়।[১]

১৩৩১ থেকে ১৩৩৮ (১৯২৪ থেকে ১৯৩১ খ্রি.) এই ক বছরের মধ্যে লেখা ছটি গল্পে বৈচিত্র্য অনেক। ‘‘স্বয়ম্বরা’’, ‘‘দক্ষিণরায়’’ আর ‘২মহেশের মহাযাত্রা’’ লেখা হয়েছে গল্পর-ভেতরে-গল্প-র আঙ্গিকে। ভেতরের গল্পে বক্তা সর্বদাই চাটুজ্যে মশায়। ‘‘ছেলেধরা’’ -ও প্রথমে লেখা হয়েছিল ঐ একই আঙ্গিকে, পরে ‘‘রাতারাতি’’-র সঙ্গে মিলে সেটি আর তেমন থাকে নি; সর্বজ্ঞ বিবরণদাতার আঙ্গিকে ঢেলে সাজা হয়েছে। অন্য দুটি গল্প, ‘‘লম্বকর্ণ’’ আর ‘‘গুরুবিদায়’’ -ও প্রথম পুরুষের আঙ্গিকে লেখা।

মনে রাখতে হবে : ১৩২৯ থেকে ১৩৩৯-ই পরশুরামের গল্পর স্বর্ণযুগ। ঐ এগারো বছরে পরশুরাম লিখেছেন ‘‘কচি-সংসদ’’, ‘‘উলটপুরাণ’’ ও ‘‘হনুমানের স্বপ্ন’’-র মতো গল্প। তবে এই পর্বে বংশোলোচনবাবুর বৈঠকখানাই বেশি জায়গা জুড়ে আছে।

‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’ সবদিক থেইে অনন্য গল্প। ভেতরের গল্পটি শুরু করার উপলক্ষ্য হিসেবে দু-চার কথা আসে, তারপরই শুরু হয চাটুজ্যে মশায়ের গল্প। শ্রোতাদের মধ্যে তিনজনের নাম করা হয়েছে: নগেন, বিনোদ উকিল আর বংশলোচনবাবু নিজে। উদো আছে কিনা বলা নেই। তবে ধরে নেওয়া যায় সেও হাজির ছিল।

এই একবারই মাত্র চাটুজ্যে মশায় বিনা বাধায় তাঁর গল্প বলতে পারেন। বিনোদ উকিলের জেরা তাঁকে সইতে হয় না, নগেন বা উদো রসভঙ্গ করে না, গবরমেন্টের মাংস খাওয়ার কথা শুনে বংশলোচনবাবু হাঁ হাঁ করে ওঠেন না (‘‘দক্ষিণরায়’’)। ভেতরের গল্প শেষ হলে তার পরের কথা জানতে চান - বিনোদ উকিল নন, বংশলোচনবাবু। তাঁর দুটি প্রশ্নর উত্তর দিয়ে ভেতরের গল্পর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেম গল্পরও সমাপ্তি ঘটে।

আর এখানেই একটা মুশকিল হয়ে যায়। ‘‘দক্ষিণরায়’’ -এর ভেতরের গল্পর শেষে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন বিনোদ উকিল। ভেতরের গল্পটি যে পুরোপুরি গুলিখুরি গল্প তাও পরশুরাম শেষে পরোক্ষে বলে দেন। ‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’-য় বিনোদ উকিল প্রথমেই নিজের চার্বাকপন্থী মত ঘোষণা করেন, কিন্তু চাটুজ্যে মশায়ের বিদ্রূপের পর কথা না বাড়িয়ে হার মেনে নেন। ফলে পুরো গল্পটি পড়ে কোনো কোনো পাঠক মনঃস্থির করতে পারে না : ব্যাপারটি কী দাঁড়াল, ভূত তাহলে সত্যি আছে না নেই। ‘‘দক্ষিণরায়’’ -এর সমাপ্তিতে পরশুরাম যে-ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, ‘‘মহেশের মহাযাত্রা’’-য় সেটি গরহাজির। তাই উল্টো বোঝার সুযোগ থাকে।

পরশুরামের অন্যান্য গল্পর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অবশ্য ঐ সুযোগ আর থাকে না। বাঙলায় হাতে গোনা যে কজন লেখককে অনড় যুক্তিবাদী বলা যায়, পরশুরাম তাঁদের একজন। এই গল্পর ভেতরেও তার প্রমাণ আছে। যে সাতকড়ি/ হরিনাথ মহেশকে ভূত দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনিও আসলে ভূতে বিশ্বাস করেন না। তার জন্যেই কলেজের ছাত্রদের ভূত সাজিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাঁর দেওয়া স্বর্গের বর্ণনাও ঠিক ধর্মবিশ্বাসীর উপযুক্ত নয়। কথাগুলো আর-একবার পড়লে মন্দ লাগবে না।

> খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছ আঙ্গুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফ’লে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা - দেবদূত গোলাপী উড়নি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।[২]

চাটুজ্যে মশায়ের কথার মধ্যে লেখক পরশুরাম মাঝে মাঝে উঁকি মারেন। এক জায়গায় তো তাঁর ভাষাই শোনা যায়। চাটুজ্যে মশায় কি বলতে পারতেন মহেশের ‘‘কনশেন্স’’ -এর বাধা দেওয়ার কথা? আর এক-জায়গায় চাটুজ্যে মশায়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের ‘‘অভিসার’’ কবিতার চরণ একটু বদলে বসানো হয়েছে : ‘‘আজি রজনীতে হয় নি সময়’’[৩] কোথায় সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও নগরনটী বাসবদত্তা, আর কোথায় ‘‘আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল’’। চাটুজ্যে মশায়ের মুখে ‘গীতা’-র বচন[৪] যতটা মানায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ বোধহয় ততটা মানায় না।

তারপরে আছে মহেশের শববাহকদের কথা। তাদের নেতা ত্রিলোচন পাকড়াশী তো গোড়াতেই শীতের ওষুধ (অর্থাৎ দিশি মদ) বাবদ ন-সিকে (এখনকার হিসেবে দুটাকা পঁচিশ পয়সা) কবুল করিয়ে নেয়। অভিজ্ঞতা থেকে পাকড়াশী বলে, মড়ার ওজন ক্রমেই বাড়ে, কারণ ''মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।'' তাই মড়ার ওজন যত বাড়ে ত্রিলোচনের খাঁই ততই বাড়তে থাকে : পনেরো থেকে কুড়ি, তারপর পঁচিশ কারণ ''এ হল মোষের গাড়ির বোঝা'', মানুষের কাঁধে বইবার নয়।

চাটুজ্যে মশায়ের শ্রোতারা যতই নিবিষ্ট মনে, অবাক হয়ে এসব শোনেন, পাঠকও কি তা-ই করবেন? আর সব শেষে মহেশ যখন ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে লেকচারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলেন, ''ও হরিনাথ - আছে, সব আছে, সব সত্যি-'', তখনও কি পাঠক হাসবেন না?

ব্যাপারটা আরও মজাদার হয়ে ওঠে অন্য একটা কারণে। মরার পরে মহেশের এই জ্ঞানোদয় হলেও, বেঁচে থাকতে তিনি যা অবিশ্বাস করতেন মরেও তিনি তা ছাড়তে রাজি নন। গয়ায় পিণ্ডি দিলে পিণ্ডি ছিটকে চলে আসে। সর্বজ্ঞ চাটুজ্যে মশায়ও বলতে পারেন না মহেশ নিজেই পিণ্ডি ফিরিয়ে দিলেন, নাকি কেউ বা কারা তাঁকে সেই পিণ্ডি নিতে দিল না। সব শেষে প্রশ্ন ওঠে : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গচ্ছিত টাকার কী হলো? চাটুজ্যে মশায় জানান, তার কাজ কিছুই হয় নি, ''ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনও ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হ'ক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফাণ্ডের নাম কেউ করে না।''

গল্পর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এইভাবেই একটা কৌতুকের স্রোত বয়ে চলে। তারপরেও যদি কোনো পাঠক মনে করেন : গল্পটি এই কথাই প্রমাণ করে যে, সত্যিই ভূত আছে, তবে তাঁকে নেহাতই অসাড় বা একেবারেই বেরসিক বলে ধরতে হয়।

তবে এও ঘটনা যে ''মহেশের মহাযাত্রা'' একদিক দিয়ে ''ভূশণ্ডীর মাঠে'-র মতোই অদ্ভুত জায়গায় শেষ হয়। ''ভুশণ্ডীর মাঠে'' পড়তে বসলে গোড়াতেই ভূতপেত্নী সম্পর্কে পাঠক - পাঠিকাকে নিজের অবিশ্বাস, অন্তত পড়ার সময়টুকুর জন্যে, মন থেকে সরিয়ে রাখতে হয়।[৫] তবেই শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী আর নেত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী নিয়ে সমস্যাটা ঠিকমতো ঠাওর করা যায়। ভূতপেত্নীর ক্ষেত্রেও কি জন্মজন্মান্তরে রামচন্দ্রর মতো একদারনিষ্ঠ বা সতীসাবিত্রীর মতো একবরনিষ্ঠ থাকা সম্ভব? এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। তেমনি বেঁচে থাকতে মহেশবাবু যা বিশ্বাস করতেন, মরে ভুত হয়েও তিনি সেই বিশ্বাস ছাড়লেন না - চরিত্রর এই আত্মসঙ্গতি (সেল্‌ফ্ কন্‌সিস্‌টেন্‌সি) সত্যিই তারিফ করার মতো। মরার পরেই মহেশবাবু বুঝেছেন 'আছে আছে সব আছে'। কিন্তু তার জন্যে জীবিতকালের অবিশ্বাস তিনি ছাড়বেন কেন?

আর ছাদের ওপর দুপদাপ শব্দ - তার ব্যাখ্যাই বা কী হবে? মহেশবাবুর ভুতই কি ঐ কাণ্ড করেছিল? নাকি ব্যাপারটা নেহাতই কাকতালীয়? সেনেটে সভা চলার সময়েই ছাদ মেরামত হচ্ছিল না তো?

ভূতের গল্প বলেই পরশুরাম এমন সব মজার চরিত্র তৈরি করতে পারেন: ভূত হয়েও যে-ভূত ভূতত্ব স্বীকার করে না। ইওরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে একেই বলে প্যার‍্যাডক্‌স্।

এ তো গেল গল্পটির বিশেষত্ব। এরপর কিছু তত্ত্বকথার সুযোগ থাকে.। সেগুলো একই সঙ্গে দর্শন ও সাহিত্য ঘটিত। সে-ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ নেই, পরের অংশটি তাঁরা না পড়লেও পারেন।

সে-আলোচনায় যাওয়ার আগে অন্য একটি কথা বলে নিই। গল্পর নামটি খেয়াল করার মতো। 'মহাযাত্রা' মানে কী? সকলেই জানেন, মহাযাত্রা বলতে বোঝায় শেষ যাত্রা, অর্থাৎ মৃত্যু ('মহাপ্রস্থান' তুলনীয়)। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। কয়েকটি শব্দর আগে 'মহৎ' (সমাসের পূর্বপদ হলে 'মহা'+ হয়) দেওয়া নিষেধ। তার কারণ ঐসব সমাসবদ্ধ শব্দ দিয়ে অপকর্ষ বা দোষ বোঝায়। 'ভট্টিকাব্য', ১।৪-এর মল্লিনাথ-রটিত টীকায় একটি শ্লোক আছে:

শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে।

মহাশঙ্খ বলেত শুধু বিরাট শাঁখই বোঝায় না, এর অন্য মানে হলো মানুষের কপালের হাড়, আর তন্ত্র-মতে মানুষের হাড় দিয়ে তৈরি মালা। মহাতৈল মানে মানুষের শরীরের তেল। মহামাংস মানে মানুষের মাংস। মহাবৈদ্য মানে আনাড়ি চিকিৎসক। মহাদ্বিজ বা মহাব্রাহ্মণ মানে নিকৃষ্ট বামুন, মরা পোড়ানো বামুন ও অগ্রদানী।[৬]

এই রকম আর একটি শব্দ 'মহাযাত্রা'। পাণ্ডবরাও মহাপ্রস্থান করেছিলেন, সেখানে তার অর্থ দাঁড়ায় মৃত্যুর জন্যেই যাত্রা করা। মহেশ কিন্তু স্বেচ্ছায় সেরকম কোনো যাত্রা করেন নি। তবু তাঁর মৃত্যুকে পরশুরাম মহাযাত্রাই বলেন। হাতিবাগান থেদ্ধেক কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট (এখনকার বিধান সরণি) ধরে, গোলদিঘি, বৌবাজারের মোড় পেরিয়ে ওয়েলিংটন (এখনকার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) অবধি খাটে চড়ে যাওয়াকে মহাযাত্রা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়?

এত সব না-জানলেও গল্পটি পড়ে মজা পেতে কোনো বাধা নেই। তবে গোটা ব্যাপারটা জানা থাকলে মজা আরও বাড়ে।

এবার তত্ত্বকথা। গল্পটি শুরু হয়েছে আচমকা। কেদার চাটুজ্যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জানিয়ে দেন: আত্মা, ভূত, পেতনী, বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা সকলেই আছেন (সম্মানসূচক 'ন'টি লক্ষ্য করা মতো)। নগেন এবার বিনোদ উকিলের কাছে জানতে চায় : আপনি ভুত বিশ্বাস করেন? বিনোদের উত্তর নিখাদ লোকায়তিকের মতো : যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ - না কিছুই বলতে পারি না।'' তার উত্তরে চাটুজ্যে মশায় ধিক্কার দিয়ে বলেন: 'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর!'' এতেও না থেকে, বিনোদ উকিলের ধারণা যে কত ভুল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন: বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বালডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মামামাতি কর কেন?

যে তিনজন সায়েবের নাম করা হয়েছে তাঁরা সকলেই বিশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রেট ব্রিটেনের রাজনীতিবিদ্, গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কখনও শাসনক্ষতায় বসে, কখনও বা বিরোধীপক্ষে থেকে এঁরা সংসদের আসর জমাতেন। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক আলোচনায় অনিবার্যভাবেই এঁদের কথা উঠত।

বিনোদ উকিল বুদ্ধিমান লোক। তিনি জানেন : চাটুজ্যে মশায়ের যুক্তিটা একেবারেই ফাঁপা। প্রত্যক্ষ থেকেই জানা যায়: সব পুত্ররই পিতা থাকে। সেই প্রত্যক্ষ থেকে অনুমান করা যায় : পিতারও পিতা ছিলেন, আর সেই পিতারও পিতা ছিলেন। এছাড়া এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা অতিদীর্ঘজীবী প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ম্যাকডোনাল্ড একবার ভারতেও এসেছিলেন, কলকাতাও ঘুরে গিয়েছিলেন। বিনোদ উকিলের পক্ষেও তাঁকে দেখা অসম্ভব ছিল না)।

বিনোদ উকিল অবশ্য এত কথায় যান নি। কারণ : তা হলে আর চাটুজ্যে মশায়ের বৈঠকি গল্প শোনা হবে না। সুতরাং তিনি কথা না-বাড়িয়ে বলে দেন: ''আচ্ছা আচ্ছা,, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।''

তাতে চাটুজ্যে মশায়ের রাগ পড়ে না। তিনি বলেন: ''আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন - দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।''

এর থেকেই ভেতরের গল্পর সূত্রপাত হয়। নগেন জিগেস করে: ''অপনি (ভূত) দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায়?'' উত্তরে চাটুজ্যে মশায় ঠিক নিজের দিব্যদৃষ্টির কথা বলেন না, কিন্তু মহেশ মিত্তির কী রকম ভুতের পাল্লায় পড়েছিলেন তার দৃষ্টান্তমূলক গল্প শুরু করেন। অবশ্য গোড়ায় তিনি যা বলেন গল্পে সে রকম হয় না। তিনি বলেছিলেন মহেশ মিত্তির ''এককালে কিছু মানতেন না, কিন্তু শেষ দফায় তাঁকেও স্বীকার করেন নি, বরং 'ভূতের অনস্তিত্ব' সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে গেছেন, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করতেও বারণ করেছেন। অর্থাৎ 'শেষ দফায়' নয়, মরার পরে তবে তিনি সর্বাস্তিবাদী হয়েছে।

এত কথা বলছি এই জন্যে যে, ভেতরের গল্পটির পটভূমিতে একটি দার্শনিক বিতর্ক উঠেছিল। প্রত্যক্ষ যাত্রার আপ্তবাক্য - দুটিই ভারতীয় দর্শনের পারিভাষিক শব্দ। সব দার্শনিক সম্প্রদায়কেই একটি বিষয়ের ফয়সালা করতে হয়েছে। সেটি হলো: প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান অর্জনের উপায় কী? এই প্রমা থেকেই ওঠে প্রমেয় (যে বিষয়ে জ্ঞান হবে), প্রমাতা (যিনি জানবেন) আর প্রমাণ (জানার উপায়) -এর কথা। বিভিন্ন দর্শীন-সম্প্রদায় মিলে অন্তত দশ রকমের প্রমাণ - এর কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে (চোখ, কান ইত্যাদি মারফত) জানাই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাই 'প্রত্যক্ষ'কে বলা হয় প্রমাণজ্যেষ্ঠ। এরপরেই আসে অনুমান ও আপ্তবাক্য-র কথা। 'অনুমান' মানেই হলো প্রত্যক্ষ থেকে পাওয়া জ্ঞানকে হেতু দিয়ে নিশ্চয় করা। আর 'আপ্ত' মানে যে-ব্যক্তি ভ্রম, প্রমাদ ও প্রতারণার মতলব না করে যথার্থ উপদেশ করেন। আপ্তবাক্য মানে তেমন ব্যক্তির বলা নির্ভুল

বাক্য। বেদ আর বেদমূলক স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র), ইত্যাদি, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রকেও আপ্তবাক্য বলা হয়। চাটুজ্যে মশায় তাই 'গীতা'-র উদ্ধৃতি দিয়ে আপ্তবাক্যর মহিমা বোঝান।[৭]

তাঁর বলা গল্পটির শেষে কী নিষ্পত্তি হলো? চাটুজ্যেমশায় বলেছেন: মহেশবাবু ছিলেন বিনোদ উকিলের মতোই প্রত্যক্ষ প্রমাণে আস্থাবান। ''বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই। কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু।" তার বদলে প্রেততত্ত্ব নিয়ে দেশী-বিদেশী বইতে দেখা গেল ''প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই, কেবল আছে - অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন।" কারও কথা বিশ্বাস করা মহেশবাবুর বৈজ্ঞানিক মেজাজে সইত না। ইংল্যান্ড-এ রয়াল সোসাইটি-র 'মটো'-ই তাঁর 'মটো': নুল্লিউস এন্ উয়েরবা, 'কারও কথা নয়'। বেঁচে থাকতে মহেশবাবু ভূত দেখতে পান নি। নিজে মরার পরেই তিনি জানালেন (উপলব্ধি করলেন) : ভূত ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু এ তো চর্মচক্ষুতে দেখা নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নয়। ফলে মরার পরেও মহেশবাবুর ভূত কিন্তু ভূত মানতে রাজি নন। বেঁচে থাকতে তিনি যে-ব্যবস্থা করে গেছেন তার যাতে এতটুকু নড়চড় না হয় ভৌতিক চোখ দিয়ে সে-দিকে তিনি কড়া নজর রাখেন। এরকম পরিস্থিতিতে মজাটাই বড় হয়ে ওঠে। ভূত আছে না নেই সে -তর্কর কোনো ফয়সালা হয় না।

এরপর সাহিত্যতত্ত্বর এক নতুন - গজানো সম্প্রদায়ের কথা তুলব। রচনা বা রচয়িতার চেয়ে পাঠকের পরিগ্রহণ (রিসেপশন)-এর দিকেই এই সম্প্রদায় জোর দেন। অন্যান্য হালফিল তত্ত্বর মতো এর জন্ম ফ্রান্স বা আমেরিকায় নয়। একদল জার্মান প্রথম এটিকে বেশ গোছানো চেহারা দিয়েছেন। ইংল্যান্ডে ও আমেরিকাতে তার অনুগামী আছেন। সাহিত্যকর্ম পড়ে পাঠক কীভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন সেইটেই এঁদের ভাবনার বিষয়। আধুনিক মনোবিদ্যা ছাড়াও ফেনোমেনোলজি নামক বিষয়ীসর্বস্ব দর্শনও তত্ত্বর পেছনে ছায়া ফেলে।

ঠাট্টা করে বলা হয়েছে, নানা ঐতিহাসিক অবস্থায় পাঠকদের পরিগ্রহণের কথা বললেও, এই তত্ত্বর দুই দিক্‌পাল, হান্‌স্ রবার্ট ইআইস ও ভোল্‌ফ্‌গাং ইসের, আসলে ওয়াকিবহাল পাঠক বলতে বোঝান তাঁদের মতোই লোক, কোনো লেখা পড়ে যাঁদের প্রতিভাব (রেসপন্‌স্) একই রকম হবে। আর এমনও সন্দেহ হয় যে সেই পাঠক আসলে সাদা চামড়ার মধ্যবিত্ত ইওরোপীয় পুরুষ।[৮]

''মহেশের মহাযাত্রা" দিয়ে এই পাঠক-প্রতিভাব তত্ত্বটি পরখ করা যাক।

গল্পটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৩১-এ। তারপর তিন পুরুষের পাঠক গল্পটি পড়েছেন। তাঁদের প্রতিক্রিয়া বত্রা প্রতিভাব, যা-ই বলুন, মোটা দাগে দু-রকমের হয়। যাঁরা ভূতে বিশ্বাস করেন, গল্পটি তাঁদের খুব মনে ধরে। ভাবটা অনেকটা এই রকম: বেশ হয়েছে। মহেশকে তো শেষ পর্যন্ত ভূতে বিশ্বাস করতে হলোই, তার ওপরে নিজেকেও এখন ভূত হয়ে ঘুরে মরতে হচ্ছে। পিণ্ডি নিলে তবু আত্মার সদ্‌গতি হতো। কিন্তু মহেশের ভূত সেই সুযোগও পেল না। চিরকাল তাকে ভূত হয়েই থাকতে হবে, মুক্তি হবে না।

আর, যাঁরা ভূতে অবিশ্বাসী, তাঁরা মজা পান মহেশের গোঁ দেখে। ভূত হয়েও মহেশ ভূতপূর্ব মতামত বহাল রেখেছেন : ''আছে আছে সব আছে" বলার পরেও পিণ্ডি নিতে রাজি হন না, নিজের শেষ ইচ্ছাপত্র অক্ষরে অক্ষরে মানতে ও মানাতে চান। ভূতে অবিশ্বাসী পাঠক - পাঠিকার কাছে গোটা ব্যাপারটাই নির্ভেজাল মজার উৎস।
এই দু-দলের মধ্যেও নিশ্চয়ই আরও অনেক ধরণের পাঠক থাকেন। তাঁদের কেউ হয়তো আবার 'পোনুর চিঠি'-র তুতির মতো: দিনের বেলা ভূতে বিশ্বাস করে না, রাতে করে (তুতি অবশ্য তার ছেলেবন্ধুদের বলেছিল: ''রাত্তিরে যে নাম করতে নেই নৈলে দেখতিস তাও করতুম না বিসসাস")।[৯] এমন আরও অনেক ধরণের পাঠক-পাঠিকা থাকতে পারেন (যেমন, পোনু দিনের বেলায় ভূতে একটু কম বিশ্বাস করত, রাত্তিরে খুব বেশি করে)। কিন্তু দেখার বিষয় হলো : ভূত সম্পর্কে তাঁদের যে-মনোভাবই আগে থেকে গড়ে উঠতে থাকুক, ''মহেশের মহাযাত্রা" পড়ার সময়ে সেটিকে তাঁরা তত গুরুত্ব দেবেন না। তাই পাঠক - প্রতিভাব দিয়ে কোনো গল্পর দোষগুণ সাফল্য-ব্যর্থতা প্রমাণ হয় না। সত্যিকারের সাহিত্যপাঠক - পাঠিকা চাটুজ্যে মশায়ের গল্পর নির্যাসটুকু বার করে নেবেন। পাঠক হিসেবে এইটুকুই তাঁদের কাছে দাবি করা যায়। একটা কাল্পনিক গল্পকে নিয়ে সত্যিমিথ্যে বিচার করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। বরং নিজের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস চেপে রেখে গল্পটি পড়ে আনন্দ পাওয়াই আসল কথা। তা না হলে পাঠক - পাঠিকা নিজেকে বেরসিক হলে প্রমাণ করবেন।[১০]

প রি শি ষ্ট

''মহেশের মহাযাত্রা" এক বহুমাত্রিক গল্প। এর ছত্রে ছত্রে ভাবনার খোরাক আছে, শুধু হাসির খোরাক নয়। এ ছাড়া পরশুরামের কথাগুলো ঠিকমতো না বুঝলে যথেষ্ট মজা পাওয়া যায় না। যেমন, চাটুজ্যে মশায় বলেন: মহেশ ''ভগবান, আত্মা, পরলোক, কিছুই মানতেন না। এমন কি স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি।" ভগবান ইত্যাদি না - মানার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে না-করার সম্পর্কটা কী? এ কি শুধুই, সুকুমার রায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন, ''ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা"?[১১] না, তা নয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে পরিষ্কার বলা আছে : পুত্র উৎপাদনের জন্যেই বিয়ে করতে হয়; বাবা মারা যাওয়ার পর সেই ছেলে তাঁর উদ্দেশে প্রতি বছর পিণ্ডি দেবে ('মনুসংহিতা', ৩। ২৭; 'নারদসংহিতা', ১।৯৮)। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্রাৎ পিণ্ড প্রয়োজনম্' - এমন একটা কথাও চালু আছে। মহেশ পরলোক মানতেন না, তাই মরার পরে 'আধ্যাত্মিক উদর'[১২] ভরানোর জন্যে পিণ্ডিরও দরকার ছিল না। এর জন্যেই তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি।

পাঠককে মনে করিয়ে দিই: মরার পরেও মহেশ পিণ্ডি নিতে রাজি হন নি। বেঁচে থাকতে যে - কারণে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি, সেই একই কারণে মরে ভূত হয়েও তিনি পিণ্ডি নিতে নারাজ।

প্রসঙ্গত চাটুজ্যে মশায়ের আর একটি কথাও নজর করার মতো। তিনি বলেন : মহেশের জন্যে শুধুই গয়ায় নয়, পিণ্ডিদাদনখাঁয় পর্যন্ত পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল। পিণ্ডিদাদনখাঁ কোনো কাল্পনিক জায়গা নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে (এখনকার পাকিস্তানে) ঝিলম নদীর দক্ষিণ তীরে সত্যিই ঐ নামের একটি ছোটো বাণিজ্য উপনগরী আছে। 'ইম্পিরিয়াল গেজিটিয়ার অব ইন্ডিয়া'-য় তার নাম Pind Dadan Khan। অবস্থান 32^0 36` উত্তর অক্ষাংশ ও $73^0$ 4` পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এখানকার লুঙ্গি, মাটির কাজ ইত্যাদি রপ্তানি হতো। ঝিলম জেলার একটি ছিল মহকুমা সদর। ১৯০১-এ এর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১৩,৭৭০। উইকিপিডিআ-য় ক্লিক করলে পিণ্ডদাদনখাঁ সম্পর্কে হালের খবর পাওয়া যাবে।

বলা বাহুল্য, গয়ার মতো স্থান-মাহাত্ম্য এর ছিল না; শুদ্ধ পিণ্ডির সূত্রে চাটুজ্যে মশায় গয়ার পাশাপাশি তার নাম করেছেন।
বাঙলায় পিণ্ডিদাদনখাঁ নামটিই চালু ছিল। রবীন্দ্রনাথের ''যোগীনদা" ('ছড়ার ছবি'-র অন্তর্গত) কবিতার প্রথম চরণেই আছে : ''যোগীনদাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে। আর খানিক এগিয়েই ঐ ভূগোল - গোলা গল্পে শোনা যায়: রাজপুত্র হারিয়ে যাওয়ার পর ''খোঁজ পড়ে যায় যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায়,/ খোঁজে পিণ্ডিদাদনখাঁয় খোঁজে লালামুসায়।"[১৩]

সংযোজন ১

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' বচনটি কোনো ধর্মশাস্ত্রে নেই, আছে চাণক্য শ্লোক সংগ্রহে। শ্লোকটি এই:

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা পুত্রপিণ্ডং প্রয়োজনম্।
হিতপ্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্বপ্রয়োজনম্

শ্লোকটির বেশ কিছু পাঠভেদ আছে। গৃহীত পাঠ হলো:

পুত্র-প্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ
হিত-প্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব - প্রয়োজনম্

এরমানে

ভার্য্যা ইচ্ছা করিবেক পুত্রের কারণ।
পিণ্ডদান মাত্র সুপুত্রের প্রয়োজন।।
মিত্র প্রয়োজন এই করিবেক হিত।
সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ ধনেতে নিশ্চিত।।

(শিশুবোধক। অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থে', নৃত্যলাল শীল, ১৩০৫, শ্লোক ৫১, পৃ. ৭৯। আশিস খাস্তগীর সম্পা., 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ - ১৮৫৫)', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬ -এ বইটি হবাহু ছাপা হয়েছে। অনিবার্যভাবে মূল শ্লোকে 'দারা' - জায়গায় 'দ্বারা' ছিল!)

শ্লোকটির অজস্র পাঠভেদের জন্যে Ludwik Sternbach, 'Canakya-Niti-Tex-Tradition (চাণক্য-নীতি-শাখা-সম্প্রদায়ঃ)', Hosiarpur : Vishveshvaranand Vedic Research Institute, Vol. I, 1963, P. 183; II : II, 196, P. 408 দ্র.।

সংযোজন ২

আপ্তবাক্য -র মহিমা সম্পর্কে চাটুজ্যেমশায় নিশ্চিত ছিলেন। তার উল্‌টো দিকে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য মনে রাখার মতো :

> বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাকের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

''বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', খণ্ড ১৪, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ. ৪০৪,।

টিকা ঃ-

১. এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৬) দ্র.।

২. এর সঙ্গে মুসলমানি বেহেস্তি (স্বর্গীয়) সাহিত্যর তুলনা করা যায়। ''বেহেস্তের হুরগণের (পরীর সঙ্গে মিলিয়ে বাঙলায় যাদের হুরি বলা হয়। হুরি মানে সুরসুন্দরী) সহিত বেহেস্তবাসী পুরুষগণের যে-মিলন ঘটবে, তাহার তুলনায় দুনিয়ার মিলন - সুখ লক্ষ ভাগের একভাগও নহে...।'' এমন কি ''আপনি আরাম - কেদারায় বসিয়া স্বচ্ছন্দে হুকা টানিতে পারিবেন, কেহই কল্কেটা পাওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়া আপনার সেই আরামের ব্যাঘাত ঘটাইবে না।'' ফাদার দ্যতিয়েন, ১০৫-এ উদ্ধৃত।

৩. ''অভিসার'' ('কথা'-র অন্তর্গত)-এ উপগুপ্ত প্রথমবার বাসবদত্তাকে বলেছিলেন, ''এখনো আমার সময় হয়নি'' আর শেষবার বলেছিলেন, ''আজি রজনীতে হয়েছে সময়''। 'রবীন্দ্র -রচনাবলী', ১:

৪. 'গীতা', ১১।৮: দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ, 'তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি''। রাজশেখর বসুর তর্জমা,

৫. স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ একেই বলেছিলেন, ''that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith.'' অধ্যায় ১৪,

৬. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান দুটিতে প্রাসঙ্গিক শব্দগুলি দ্র.।

৭. বিষদভাবে জানতে চাইলে 'ন্যায়সূত্র', ১।১।৩-৮, ২।২।১-১২দ্র.।

৮. এলিঅট ও আওয়েন্‌স, পৃ.১৪৭। পাঠক - প্রতিভাব নিয়ে আরও জানতে চাইলে অ্যাব্রাম্‌স্‌, পৃ. ২৬৮-৭৫ দ্র.।

৯. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়.

১০. এই দুঃখেই কবি বররুচি লিখেছিলেন :

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
হানিবে, অবিচল রব তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে
ললাটে লিখো না, হে লিখো না হে।
(রবীন্দ্রনাথের তর্জমা)

'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ৩: ১২৫০, ১২০৫। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, 'রূপান্তর',

১১. 'সুকুমার রচনাবলী', ২: ৯৬-এ উদ্ধৃত।

১২. পরশুরামের ''প্রেমচক্র'' গল্পে ('হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প'-র অন্তর্গত) রাহুর এই অসাধারণ উদরটির কথা আছে।

১৩. 'রবীন্দ্র - রচনাবলী' ৩: ৫০১, ৫০৩।

রচনাপঞ্জি

গীতা। রাজশেখর বসু দ্র.।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সং, ১৯৩৭।

ন্যায়সূত্র। মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় অনূ.। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পা. ভারত দর্শনসম্ভার ১। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

ফাদার দ্যতিয়েন। রোজনামচা। গ্রন্থালয়, ১৯৯১।

ভিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পোনুর চিঠি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং, ১৩৬১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র - রচনাবলীত। খণ্ড ১ ও ৩। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮০, ১৯৮৩। রূপান্তর। বিশ্বভারতী, ১৩৭২।

রাজশেখর বসু। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৯৫।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ''পরশুরামের গল্পে আড্ডা'', অনুষ্টুপ, ৪০ :৪, ২০০৬।

সুকুমার রায়, সুকুমার সমগ্র রচনাবলী। খণ্ড ২। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৭৫।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ। নয়াদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৭।

Abrams, M.H. A Glossary of Literary Terms. Bangalore : Prism Books, 1993. Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria. London, etc.: Everyman's Library, 1982

Eliot, Simond and W.R. Owens. A Handbook to Literary Research. London: Routledge and the Open University, 1998.

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : কৌশিক মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ ভট্টাচার্য, সন্দীপন সেন, এস. পি (শিবপ্রসাদ) দাশগুপ্ত।